ইউনিট ৫

মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকারণ

ভূমিকা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য পুকুর ডোবা, খাল বিল, নদ-নদী, হাওর-বাওড় ও বিস্তীর্ণ প্লাবন ভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের এ বিশাল জল রাশি অপরিমেয় মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশের স্বাদু পানিতে রয়েছে ২৭২ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি এবং সামুদ্রিক উৎসে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি। মাছ পঁচনশীল দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্য এবং পঁচন রোধ করার লক্ষ্যে মাছ আহরণের পর থেকেই সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়। মাছ ও চিংড়ি পঁচনশীল দ্রব্য তাই এদের আহরণের পর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরনের ত্রুটি বা অবহেলার জন্য একদিকে যেমন মাছ বা চিংড়ির পঁচন ধরে অপরদিকে এদের বাজারজাতকরণও বাধাগ্রস্ত হয়।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণের ধারনা ও প্রয়োজনীয়তা, মাছ পঁচনের কারণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, মাছ পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, চিংড়ি পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পদ্ধতি, এবং ফরমালিন শনাক্তকারী কীট দ্বারা ফরমালিনযুক্ত মাছ শনাক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : মাছ পচনের কারণ ও সংরক্ষণ
পাঠ - ৫.২ : মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ
পাঠ - ৫.৩ : চিংড়ি পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ
পাঠ - ৫.৪ : ব্যবহারিক : ফরমালিন শনাক্তকারী কিট দ্বারা ফরমালিন যুক্ত

পাঠ-৫.১ মাছ পঁচনের কারণ ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ পঁচনের কারণ বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাছ সংরক্ষণ কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মাছ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ সংরক্ষনের সুবিধা ও অসুবিধা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চিংড়ি সংরক্ষণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চিংড়ি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ পচণের কারণ

বিভিন্ন কারণে মাছের পচনক্রিয়া শুরু হয়। তবে মাছের পচনক্রিয়া প্রধানত তিনটি উৎস হতে শুরু হয়। নিচে মাছ পচনের প্রধান তিনটি কারণ আলোচনা করা হলো-

১. মাছের দেহের অভ্যন্তরের এনজাইমের ক্রিয়া : মাছের দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের এনজাইম বিদ্যমান। এসব এনজাইম জীবিত অবস্থায় মাছের উপকারে আসে, পক্ষান্তরে মাছ মরে গেলে এগুলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবিত অবস্থায় মাছ তাদের খাদ্য হজম ও দেহ কোষ গঠনের জন্য এসব এনজাইমকে ব্যবহার করে। মাছ মারা যাওয়ার পর এসব এনজাইম তাদের দেহে বিদ্যমান থাকায় তাদের ক্রিয়ার ফলে মৃত মাছের কোষ-কলা ভেঙ্গে যায় ও মাছ পচতে শুরু করে। মাছের দেহভাঙ্গনের এনজাইমের এই ক্রিয়াকে অটোলাইসিস (Autolysis) বলে। অটোলাইসিস ক্রিয়ার কারণেই মাছের স্বাদ নষ্ট হয়, পেশী নরম হয়, চোখ গর্তের মধ্যে চলে যায় এবং দেহ বিবর্ণ হয়।

২. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীবের ক্রিয়া-বিক্রিয়া : মাছের দেহের বিভিন্ন অংশ যথা- আইশ, চামড়া, ফুলকা নাড়ীভুড়ি ইত্যাদিতে অসংখ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া থাকে। জীবিত অবস্থায় এসব জীবাণু মাছের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু মাছ মরার পর আমাদের চারপাশের পরিবেশে বিদ্যমান জীবাণু এবং মাছের পরিচর্যার সময়, মানুষের হাত, পরিবহণে ব্যবহৃত পাত্র থেকে জীবাণু মাছকে সংক্রমিত করতে পারে। মাছ মরার পর মাছের বিভিন্ন অংশের জীবাণু এবং পরিবেশ ও ব্যবহৃত পাত্রের জীবাণু মাছের দেহে এনজাইম নিঃসরণ করে মাছের মাংসপেশী নরম করে ফলে দ্রুত মাছের পঁচন ক্রিয়া শুরু হয়।

৩. বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয় : মাছের দেহ নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। তন্মেধ্যে আমিষ, স্নেহ বা চর্বি প্রধান। মাছের দেহে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। তাছাড়া মাছের চর্বিতে থাকে প্রচুর পরিমাণ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডসমূহ। মাছ মরে যাওয়ার পর এসব অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড অক্সিজেন (O_2) সাথে বিক্রিয়া করে। মাছের দেহের রাসায়নিক পদার্থসমূহে এ ধরনের ক্রিয়া, বিক্রিয়ার ফলে মাছের জীবকোষ ভেঙে যায় এবং মাছ পচতে শুরু করে।

মাছ সংরক্ষণ

মাছ পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। মাছের পুষ্টিমান বজায় রাখার জন্যে এবং পচন রোধ করার লক্ষ্যে মাছ আহরণের পর থেকেই সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। মাছ ধরার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে মাছ মরে যাওয়ার পর পঁচতে শুরু করে। মাছ মরে যাওয়ার পর থেকেই পচনক্রিয়া শুরু হয় বিধায় ক্রেতাদের নিকট পোঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত এদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের কোন ত্রুটি বা অবহেলা হলে মাছ পঁচতে শুরু করে। মাছ একবার পঁচে গেলে কোনভাবেই আর তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। সাধারণত অণুজীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মাছের পচন হয়।

মাছ সংরক্ষণ বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যে পদ্ধতিতে মাছের গুণগত মান ঠিকা রাখা যায়। মাছ সংরক্ষণের জন্যে কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো অণুজীব থেকে মাছকে দূরে রাখা, অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে বিঘ্নিত করা, মাছ থেকে পানি অপসারণ করা এবং অণজীবকে ধ্বংস করা।

চিংড়ি সংরক্ষণ

মৎস্য জাতীয় প্রাণি দ্রুত পচনশীল। সে হিসেবে চিংড়িও পঁচনশীল। এ পঁচনক্রিয়া চিংড়ি আহরণ করার পর থেকেই শুরু হয়। তাই চিংড়ি আহরণের পর যত দ্রুত সম্ভব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। সঠিক নিয়মে সঠিকসময়ে চিংড়ি সংরক্ষণ না করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিংড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাংলাদেশে মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে উপকূলীয় অঞ্চলের আধা লবণাক্ত জলাশয়ের ঘেরসমূহে প্রচুর হরিণা, চালি, সাদা চিংড়ি ও গুড়া চিংড়ি ধরা পড়ে। রপ্তানিযোগ্য বড় আকারের চিংড়িগুলো বেশি দামে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু ছোট আকারের চিংড়িগুলোর হিমায়িত প্রক্রিয়াজাতকরণ লাভজনক হয় না বিধায় এদের দামও কম হয়ে থাকে। যেহেতু নির্দিষ্ট মৌসুমেই চিংড়ি ধরা হয় তাই এদের পচন রোধ করে দেশে বা বিদেশের বাজারে ক্রেতাদের নিকট পৌছানোর জন্য চিংড়ি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। চিংড়ি সংরক্ষণ হলো এমন একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে চিংড়ির গুণগত মান ঠিক রেখে ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌছানো হয়। চিংড়ি যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে এদেশের হাজার হাজার টন চিংড়িকে পচন থেকে রক্ষা করা সম্ভব। বাংলাদেশে চিংড়ি আহরণের পর কাঠের বা বাঁশের তৈরি ঝুঁড়িতে বরফ দিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। আবার কখনো কখনো বরফ সহকারে চাটাই বা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি : মাছ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সকল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল মাছের গুণগত মান ঠিক রাখা। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণের কারণে সংরক্ষিত মাছে গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, ও বাহ্যিক গঠনে কিছুটা পরিবর্তন হয়। মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

ক. বরফজাতকরণ বা আইসিং (Icing)।
খ. লবণজাতকরণ বা সল্টিং (Salting)।
গ. শুটকিকরণ বা ড্রাইং (Drying)।
ঘ. হিমায়িতকরণ বা ফ্রিজিং (Freezing)।
ঙ. টিনজাতকরণ বা ক্যানিং (Canning)।
চ. ধূমায়িতকরণ বা স্মোকিং (Smoking)।

ক. বরফজাতকরণ (Icing) : বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলে। এটি মাছ সংরক্ষণের একটি স্বল্পকালীন পদ্ধতি। বরফ দিয়ে মাছের দেহের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস ($0°C$) বা এর কাছাকাছি এনে অণুজীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যহত করা ও বংশ বিস্তারে বাধাগ্রস্ত করে মাছ সংরক্ষণকে বরফজাতকরণ বলা হয়। বাংলাদেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য ব্লক আইস বেশি ব্যবহৃত হয়।

বরফজাতকরণের সুবিধা : বরফের সাহায্যে মাছ সংরক্ষণের অনেক সুবিধা রয়েছে। যথা :

১. যেকোন মৌসুমে মাছ সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।
২. মাছ সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সহজ।
৩. আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে বরফ সহজলভ্য।
৪. যেকোন আকারের মাছ এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়।
৫. বরফ ক্ষতিকর নয় এবং মাছের সংস্পর্শে এসে খুব দ্রুত মাছকে ঠাণ্ডা করে মাছে পঁচন রোধ করে।
৬. বরফ দ্বারা সংরক্ষিত মাছ সহজেই পরিবহণ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি : এদেশে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে সাধারণ পানি দ্বারা ধুয়ে নেয়া হয়। অতঃপর বাঁশের চাটাই বা মাদুরের তৈরি টুকরীতে বরফ ও মাছ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়। সাধারণত ৪ ভাগ মাছের সাথে এক ভাগ বরফ দেয়া হয়। সাধারণত পরিবহন দূরত্ব ও সময়ে ওপর ভিত্তি করেবরফের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বড় আকারের বরফের ব্লককে গুঁড়া করে ব্যবহার করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ ও বরফ পাত্রে রাখার পর মাদুর বা চটের টুকরা দিয়ে ঢেকে সেলাই করা হয়। পরে কাঠের বাক্সে করে দূবরর্তী স্থানে পরিবহন করা হয়। বরফ ও মাছের যথাযথ অনুপাত এবং সঠিক পাত্র ব্যবহার করে মাছকে বরফজাত করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা :

১. বরফ তৈরিতে অধিকাংশ সময়ই অপরিষ্কার পানি ব্যবহার করে বিধায় ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীব দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
২. তাপ কুপরিবাহী পাত্রে ব্যবহার না করলে বরফের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী সম্ভব নয়।
৩. ব্যবহৃত বরফের টুকরা বড় হলে মাছের শরীরে ক্ষতি হতে পারে।
৪. বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় না বলে মাছের পুষ্টিমান ঠিক থাকে না।
৫. সংরক্ষণের সময় ব্যবহৃত পাত্র ভালভাবে পরিষ্কার না করার কারণে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা মাছ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের অসুবিধা দূর করার উপায় : প্রচলিত পদ্ধতিতে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ দূরীকরণ এবং মাছের গুণজাতমান বাড়ানোর জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।

১. সংরক্ষণের জন্যে ব্যবহৃত মাছগুলো সবসময় সতেজ বা টাটকা হওয়া উচিত।
২. একই প্রজাতির একই আকারের মাছ একপাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত।
৩. বরফ তৈরিতে ব্যবহৃত পানি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৪. বড় আকারের মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাছের দেহ হতে নাড়ী ভুড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।
৫. বরফ ও মাছের অনুপাত সঠিক রাখা উচিত। বাংলাদেশে শীতকালে বরফ ও মাছের অনুপাত ১ ঃ ২ এবং ১ ঃ ১ হওয়া উচিত।
৬. মাছ সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত পাত্র ও সরঞ্জামাদি সবসময় জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
৭. পাত্রে বরফ ও মাছ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন পাত্রের বরফ গলিত পানি, মাছের ময়লা ও রক্ত সহজেই পাত্রের নিচে চুইয়ে যায়।
৮. মাছ সংরক্ষণের সময় ঝুড়ি বা পাত্রে প্রথমেই একস্তর বরফ দিতে হবে। তারপর মাছ এবং সবশেষে পাত্রের উপরের মুখ বন্ধ করার পূর্বে উপরে আরেক স্তর বরফ দেয়া উচিত।

খ. লবণজাতকরণ (Salting) : লবণজাতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি সহজ ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি। লবণজাতকরণ হল এমন একটি মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি যেখানে অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছের দেহে সাধারণ লবণ প্রবেশ করানো হয়, ফলে মাছের দেহ থেকে পানি বের হয়ে আসে। এতে মাছের দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং মাছের দেহে লবণের ঘনত্ব বেড়ে যায় যা অণুজীবের জন্ম ও বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, ফলশ্রুতিতে মাছ সংরক্ষিত হয়। শুধুমাত্র চর্বিযুক্ত মাছকে লবণজাতকরণ করা হয়, লবণায়নের ফলে মাছের দেহের গঠনের, বর্ণের ও গন্ধের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব হয়।

লবণায়নের প্রকারভেদ : লবণজাতকরণ পদ্ধতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. শুষ্ক লবণজাতকরণ (Dry salting) : এ পদ্ধতিতে মাছকে কেটে ধোয়ার পর দানাদার লবণ মিশায়ে সংরক্ষণ করা হয়।
২. আর্দ্র লবণজাতকরণ (Wet salting) : এ পদ্ধতিতে মাছকে লবণ দ্রবণে ডুবানো হয় ফলে লবণ মাছের দেহে প্রবেশ করেও দেহ হতে পানি বেরিয়ে আসে। দেহ হতে পানি বের হওয়ার কারণে লবণ দ্রবণে ঘনত্ব কমে যায়।
৩. মিশ্র লবণজাতকরণ (Mixed salting) : এ পদ্ধতিতে মাছকে প্রথমে শুষ্ক লবণ দিয়ে লবণায়িত করা হয়। পরবর্তীতে লবণ দ্রবণে রেখে দেয়া হয়। এটি আর্দ্র লবণকাতকরণের তুলনায় ভাল ফলদায়ক।

বাংলাদেশে মাছ লবণায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহ : প্রচলিতশুষ্ক দানাদার লবণ ব্যবহার করে বাংলাদেশে মাছকে লবণজাত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মাছের লবণজাতকরণের দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. শুষ্ক লবণায়ন পদ্ধতি এবং
২. ভিজা লবণায়ন পদ্ধতি।

১. শুষ্ক লবণায়ন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে মাছকে যে পাত্রে রাখা হয় সে পাত্রের নিচ দিকে ছিদ্র থাকে যেন লবণের দ্রবণ তলা দিয়ে বের হতে পারে। সাধারণত বাঁশে তৈরি ঝুড়ি এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে মাছের লবণায়নে নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় :

ক. ড্রেসিং : প্রথমে মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়ী-ভুড়ি দেহ থেকে ফেলে দেয়া হয়। অতঃপর আড়াআড়িভাবে মাছটির বুকের দিক হতে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত কয়েকটি টুকরায় ভাগ করা হয়। এমনভাবে টকুরা করা হয় যেন টকুরাগুলো পিছনের দিকে সংযুক্ত থাকে।

খ. লবণের অনুপ্রবেশ : শুষ্ক মাছের দেহের ভিতর ও বাইরে ভালভাবে লবণ মেখে দেয়া হয়। চোখ এবং ফুলকার ভিতরেও লবণ ঢুকানো হয়। এ ক্ষেত্রে লবণ ও মাছের অনুপাত ১ ঃ ৪ হয়। অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ায় মাছে পেশীর ভিতর লবণের অনুপ্রবেশ ঘটে।

গ. রাইপেনিং : লবণায়িত মাছকে ঝুড়িতে রাখা হয়। পূর্বেই ঝুড়ির তলায় লবণের একটি আস্তরণ দেয়া থাকে। এরপর পর্যায়ক্রমে একবার মাছ পরবর্তীতে লবণ এভাবে সমস্ত ঝুড়ি মাছ দ্বারা সাজানো হয়। পরে খড়ের তৈরি মাদুর দিয়ে ঝুড়িকে ঢেকে রাখা হয়। অতঃপর ঝুড়িকে সাধারণ তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ৭-১০ দিনে মাছ রাইপেনিং সমাপ্ত হয়।

ঘ. গুদামজাতকরণ : রাইপেনিং করার পর মাছগুলোকে টিনের পাত্রে গুদামজাত করা হয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাজারজাত করা হয়।

২. ভিজা লবণায়ন পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে প্রথমে মাছকে ড্রেসিং করা হয়। এক্ষেত্রে ড্রেসিং-এর সময় মাছের মাথা সম্পূর্ণরূপে কেটে আলাদা করা হয়। এ পদ্ধতিতে মাছকে এমনভবে তীর্যক করে কাটা হয় যেন কাটা অংশের অধিকাংশ জায়গা বাইরে খোলা থাকে। এর ফলে মাছের লবণায়ন দ্রুত সম্পন্ন হয়। তারপর মাছকে শুষ্ক লবণ দিয়ে মাখানো হয়। অতঃপর লবণ মাখানো মাছকে টিনের পাত্রে এক স্থানে সাজানো হয়। এরূপে পর্যায়ক্রমে টিনের কিছু অংশ ফাঁকা রেখে লবণ মাখানো মাছকে টিনের পাত্রে পূর্ণ করা হয়। ফাঁকা অংশ মাছের দেহ হতে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বের হয়ে আসা পানি দ্বারা পূর্ণ হয়। তুলনামূলকভাবে ভিজা বা আর্দ্র লবণজাতকৃত মাছের গুণগত মান ভাল হয়ে থাকে এবং মাছকে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রখা যায়।

ইলিশ মাছ লবণজাতকরণ পদ্ধতি : ইলিশ মাছ অধিক চর্বিযুক্ত বিধায় শুটককিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যায় না। অপরপক্ষে বরফায়ন স্বল্পমেয়াদী সংরক্ষণ পদ্ধতি আর হিমায়ন ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তাই বাংলাদেশে জেলেরা লবণজাতকরণের মাধ্যমে ইলিশ মাছকে সংরক্ষণ করে থাকে। লবণায়নের পূর্বে মাছকে ড্রেসিং করে আঁইশ, নাড়িভুঁড়ি কেটে ফেলা হয়। ধারালো ছুরি বা দা দিয়ে মাছের পিঠ থেকে পেটের দিকে আড়াআড়িভাবে $^{১}/_{২}$ ইঞ্চি পুরু করে টুকরা করা হয়। কখনো কখনো পেটের দিকে সংযুক্ত রেখে কাটা হয়। অতঃপর মাছে ওজনের ১৫-২৫% সাধারণ লবণ হাত দ্বারা ভালভাবে ঘষে কাটা টুকরায় মিশানো হয়। পরে লবণ মিশ্রিত টুকরাগুলোকে ঝুড়িতে বা কাঠের পাটাতনের উপর স্তূপাকারে রাখা হয়। ঝুড়ি বা পাটাতনে পূর্বেই লবণের হালকা স্তর দেয়া থাকে। সবশেষে স্তূপীকৃত টুকরাগুলোকে মাদুর বা চট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে ৫-৭ দিনে মাছের রাইপেনিং হয়। ফলে মাছের গঠন, গন্ধ, স্বাদ ও বর্ণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন হয়।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের সুবিধা :

১. ইলিশ মাছ চর্বিযুক্ত হওয়ায় শুটকিকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু লবণায়নের মাধ্যমে সহজেই এ মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব।
২. এ পদ্ধতি সহজ ও জেলেদের নিকট অতি পরিচিত।
৩. এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মাছের পুষ্টিমান অপরিবর্তিত থাকে।
৪. বাংলাদেশে লবণ অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য।

বাংলাদেশে ইলিশ মাছ লবণজাতকরণের অসুবিধা :

১. ভালভাবে ড্রেসিং করা হয় না এবং ড্রেসিং-এর পর মাছ ভাল করে ধোয়া হয় না। তাই গুণগত মান কিছুটা নষ্ট হয়।
২. লবণায়নের সময় কোন প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না।
৩. অনেক সময় অপরিষ্কার লবণ ব্যবহার করার ফলে মাছের গুণগত মান খারাপ হয়।
৪. লবণ ও মাছের কোন আদর্শ অনুপাত নেই।

৫. লবণজাতকরণে বাজারের অবিক্রিত পচা কিংবা বাসি মাছ ব্যবহার করা হয় ফলে লবণায়িত মাছে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।
৬. অনেক সময় অতিরিক্ত লবণ ব্যবহৃত হয় ফলে প্রোটিন ডিন্যাচারেশন হয়।
৭. লবণায়নের পর মাছ খোলা অবস্থায় রাখা হলে মাছের চর্বি বাতাসের সংস্পর্শে এসে জারণের ফলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় ও উপদানের গুণগত মান খারাপ হয় এবং চাহিদা কমে যায়।

লবণজাতকরণের সুবিধাসমূহ :

১. লবণজাতকরণের মাধ্যমে মাছ সংরক্ষণে খরচ কম হয়।
২. লবণজাতকৃত মাছকে দীর্ঘদিন সংরক্ষিত রাখা যায়।
৩. এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ সহজ।
৪. আমাদের দেশে লবণ সস্তা ও সহজলভ্য
৫. লবণজাতকৃত মাছ অন্যান্য সংরক্ষণ পদ্ধতির তুলনায় সহজে পরিবহণ করা যায়।

গ. **শুঁটকিকরণ (Drying) :** প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে সূর্যালোক ও বাতাসের মাধ্যমে মাছ থেকে পানি বা জলীয় অংশ হ্রাস করানোকে শুঁটকিকরণ বলা হয়। মাছের শরীরে শতকরা প্রায় ৭০-৮০ ভাগ পানি থাকে। মছ ধরার পর দীর্ঘক্ষণ রেখে দিলে মাছ পচতে শুরু করে। সূর্যালোকে মাছকে শুকানো হয় বলে মাছের পচন রোধ হয়। সূর্যালোকে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ বাংলাদেশে একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি।

শুঁটকিকরণের উদ্দেশ্য : শুঁটকিকরণের প্রধান উদ্দেশ্য হল মাছকে সংরক্ষণ করা। তাছাড়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়।

১. মাছের পুষ্টিগত মান ঠিক রাখা।
২. মাছ সংরক্ষণের খরচ কমিয়ে সহজে গুদামজাত করা।
৩. উৎপাদনকে বাণিজ্যিকভাবে ও পুষ্টিমানের বিচারে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।
৪. স্বল্প পরিশ্রমে এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।

শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : বাংলাদেশে সাধারণত শীত মৌসুমে সূর্যালোকের সাহায্যে শুকিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হয়। এ সময়ে আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত কম থাকে। এছাড়া সূর্যালোকের স্থায়িত্বের কারণে শুঁটকিকরণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। বৃহত্তর চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, ময়মসিংহ প্রভৃতি জেলায় অধিক হারে মাছ শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। কারণ এসব জেলায় হাওড় বাঁওড়, বিল ও উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। ছোট ও বড় উভয় ধরনের মাছকে শুঁটকিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ছোট মাছের ক্ষেত্রে বড় মাছের তুলনা কম সময় ব্যয় হয়। বাংলাদেশের সূর্যালোকে যেসব মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়, সেগুলো হল- চান্দা, পুঁটি, মলা, ডেলা ইত্যাদি। আর যেসব বড় মাছ শুঁটকি করা হয় সেগুলো হল- শোল, গজার, বোয়াল, টাকি, লইট্টা, ছুটি, কোরাল, ফলিচান্দা, রূপচান্দা ইত্যাদি।

ছোট মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : চান্দা, মলা, ঢেলা, পুঁটি টেংরা ইত্যাদি ছোট মাছকে সূর্যালোকে শুকানো হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত মাছের আঁইশ নাড়ী-ভুঁড়ি পাখনা ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হয় না। শুকানোর পূর্বে কখনো কখানো মাছকে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। পরে মাছগুলোকে চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে রোদে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত ৩-৫ দিনের মধ্যে শুঁটকিকরণ সম্পন্ন হয়।

মাছ শুকানোর সময় বিভিন্ন ধরনের অণুজীব, পোকা-মাকড়, পাখি, কীটপতঙ্গ আক্রমণ করতে পারে। তাই পলিথিন সীট/জাল ব্যবহার করে প্রতিরোধ করা যায়। দ্রুত শুকানোর জন্য মাছগুলোকে উল্টিয়ে দেয়া হয়।

বড় মাছ শুঁটকিকরণ পদ্ধতি : যেসব বড় মাছ শুঁটকিকরণ করা হয়, সেগুলো হল- শোল, গজার, বোয়াল, লইট্টা, ছুরি ইত্যাদি। বড় মাছের শুঁটকিকরণ পদ্ধতিকে ধারাবাহিকভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো-

ক. টাটকা ও তাজা মাছ শুঁটকিকরণের জন্যে বাছাই করতে হবে, এতে উন্নত মানের শুঁটকি তৈরি সম্ভব হয়।
খ. প্রথমেই মাছের আঁইশ, পাখনা, নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি ফেলে দিয়ে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।

গ. ধোয়ার পর মাছকে মাথা হতে লেজের দিকে মেরুদণ্ড বরাবর এমনভাবে কাটা হয় যেন লেজের দিকে সামান্য অংশ সংযুক্ত থাকে, যা মাছকে রেদে শুকানোর সময় ঝুলিয়ে রাখতে সহায়তা করে। প্রতিটি কাটা ফালিকে ফিলেট বলা হয়।

ঘ. কাটা প্রতিটি ফালিকে ছুরি দিয়ে মাঝ বরাবর ২/৩ বার কাটা হয় যা মাছকে দ্রুত শুকাতে সাহায্য করে।

ঙ. পাখিরা অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাছগুলোকে শুকাতে ৭-৮ দিন সময় লাগে।

ঝ. শুঁটকি মাছে সাধারণত ১০-২০% জলীয় অংশ থাকে।

উপরিউক্ত উপায়ে শুঁটকি করার পর মাদুর বা কুঁড়েঘরে রাখা হয়। পরবর্তীতে মাটির পাত্র বা মটকায় রেখে দেয়া হয়। মাটির পাত্রের অভ্যন্তরভাগে ভালভাবে মাছের তেল মাখানোর পর শুঁটকিগুলো পাত্রে রাখা হয়। ফলে কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পায়।

বাংলাদেশে শুঁটকিকরণের গুরুত্ব:বাংলাদেশে শীত মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা পড়ে। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সব মাছ বাজারজাত করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে আহরিত এলাকায় কম দামে মাছ বিক্রি করতে হয় অথবা মাছ পঁচে যায়। তাই সূর্যালোকের সাহায্যে মাছ শুঁটকিকরণ বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিচে বাংলাদেশের শুঁটকিকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো-

১. এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্যতার কারণে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করতে অক্ষম। তাই প্রাকৃতিকভাবে স্বল্প খরচে মাছ সংরক্ষণ তথা শুঁটকিকরণ বাংলাদেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২. এ পদ্ধতি জেলেদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য এবং অতি পরিচিত।

৩. এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ পদ্ধতি।

৪. শুঁটকিকরণের পর শুঁটকির তৈরিকৃত খাদ্যের গুণগতমান তাজামাছের সাথে তুলনীয়।

৫. এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ পদ্ধতি বিধায় মাছ অনেকদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ফলে যখন বাজারে মাছের পরিমাণ কমে যায় তখন শুঁটকি মাছ বাজারে সরবরাহ করে মাছের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়।

৬. বাংলাদেশে শীত মৌসুমে অর্থাৎ মাছ ধরার ঋতুতে আবহাওয়া ও সূর্যালোক শুঁটকিকরণের অনুকূলে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে শুঁটকিকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতি শুঁটকিকরণের অসুবিধা :

বাংলাদেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাছ শুকানোর কতকগুলো অসুবিধা রয়েছে। যেমন-

১. শুঁটকিকরণ সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল হওয়ার আর্দ্রতা বেশি থাকলে মাছ শুকাতে অধিক সময়ে প্রয়োজন হয়।

২. শুঁটকিকরণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলায় শুটকি রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. শুঁটকির গঠন কখনো শক্ত হলে রান্না করায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

৪. উন্মুক্ত স্থানে শুঁটকিকরণ করা হয় বিধায় সতর্কতার অভাবে বিভিন্ন ধরনের পোকার লার্ভা দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।

৫. শুঁটকি অনেক ক্ষেত্রে কালো বর্ণের হয়, ফলে চাহিদা কিছুটা কমে যায়।

৬. অনেক সময় শুঁটকিকে উজ্জ্বল বর্ণের করার জন্য তেল দ্বারা ব্রাশ করা হয়, ফলশ্রুতিতে বিভিন্নভাবে সংক্রমিত হতে পারে।

৭. অনেক সময় পচা মাছ দ্বারা শুঁটকিকরণ করা হয় বিধায় গুণগত মান ঠিক থাকে না।

৮. ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে শুঁটকি গুদামজাত করার ফলে গুণগত মান নষ্ট হতে পারে।

শুঁটকিকরণের অসুবিধা দূরীকরণের উপায় :

বাংলাদেশে শুঁটকির গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. শুঁটকিকরণের জন্যে অবশ্যই টাটকা মাছ ব্যবহার করা উচিত। অধিক চর্বিযুক্ত মাছ শুঁটকিকরণে ব্যবহার করা উচিত নয়।
২. শুঁটকিকরণের জন্যে সর্বদা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যবিধি মানা উচিত। ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারের আগে ও পরে ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। একাজে ক্লোরিন পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. মাছের নাড়ি-ভুড়ি, পাখনা, আঁইশ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ছড়াতে হবে যেন মাংসের কোন অংশে ক্ষতি না হয়।
৪. ড্রেসিং করার পর মাছকে উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত যেন প্রাথমিক সংক্রমণ না হয়। মাছকে লঘু লবণ পানি (২ - ৫%) অল্প সময়ের জন্য (সর্বোচ্চ ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখা যেতে পারে।
৫. শুঁটকিকরণের সময় মাছকে মাটিতে বা বালতিতে রাখা উচিত নয়। মাচায় বা চাটাই-এর উপর শুকানো উচিত। ফলে শুকানোর প্রক্রিয়াও দ্রুত হয়। আর পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে শুকানোর সময় জাল টাঙিয়ে রাখা উচিত।
৬. খোলা জায়গায় শুঁটকি মজুদ না করে বায়ু নিরোধক পাত্রে মজুদ করা উচিত। ক্ষেত্রবিশেষে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে অধিক পরিমাণ শুঁটকি মজুদের জন্যে টিনের পাত্র ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে BHT, BHA, Vit-C, এক্সটোকোফেরল ইত্যাদি এন্টি অক্সিডেন্ট ব্যবহার করে পাত্রের অভ্যন্তরে জীবাণু রোধ করা উচিত।

ঘ. হিমায়িতকরণ (Freezing) : হিমায়িতকরণ মাছ সংরক্ষণের একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে এক বছর পর্যন্ত গুণগত মান অক্ষণ্ন থাকে। যে পদ্ধতিতে মাছের দেহে তাপ অপসারণের মাধ্যমে দেহস্থিত পানিকে সম্পূর্ণরূপে বরফে পরিণত করা হয় তাকে হিমায়িতকরণ বলা হয়। বাংলাদেশে চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সামগ্রী এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। হিমায়ন দুই ধরনের হতে পারে। যথা : দ্রুত ও ধীর হিমায়ন। ধীর হিমায়ন সবচেয়ে ভাল হিমায়িতকরণ পদ্ধতি।

হিমায়িতকরণ পদ্ধতি : বরফজাতকৃত বড় আকারের মাছ নাড়ি-ভুঁড়ি, মাথা ও পাখনা ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হয়। চিংড়ির ক্ষেত্রে মাথা ফেলে দিয়ে সাইজ অনুসারে আলাদা করা হয়। পরবর্তীতে ২০ হতে ৮০ ভাগ ক্লোরিন পানিতে মাছগুলো ডুবিয়ে রাখা হয়। মাছ ও চিংড়ি প্রয়োজন অনুযায়ী ধারালো ছুরি দিয়ে টুকরা করা হয়। টুকরাগুলো ১০-১২ ভাগ সোডিয়াম ট্রাইফসফেট দ্রবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীতে হিমায়িত করা হয়।

ঙ. টিনজাতকরণ (Canning) : টিনজাতকরণ একটি দীর্ঘমেয়াদী মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি। টিনজাতকরণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে মাছকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতিউচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয়। বাণিজ্যিকভাবে জীবাণুমুক্ত বলতে বোঝায় যতটুকু জীবাণুমুক্ত করার ফলে সকল ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মারা যায় বা ধ্বংস হয়। এ পদ্ধতিতে ৩ বছর পর্যন্ত মাছ সংরক্ষণ করা যায়।

টিনজাতকরণ পদ্ধতি : এটি বেশ কতকগুলো ধাপে সম্পন্ন হয়। টিনজাতকরণ পদ্ধতিটির বিভিন্ন ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. কাঁচামাল নির্বাচন : মাংসল ও চর্বিযুক্ত টাটকা মাছ টিনজাতকরণের জন্য উপযোগী।
২. টিন বা কৌটা ভর্তিকরণ : কৌটা হিসেবে টিনের পাত্র বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে অ্যালুমিনিয়াম বা কাঁচের পাত্রও ব্যবহৃত হয়। কৌটাকে হাত বা মেশিনের সাহায্যে পূর্ণ করা হয়। সাধারণত কৌটার উপরিভাগ সামান্য পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা হয় এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা এ ফাঁকা স্থান পূরণ করা হয়।
৩. বিভিন্ন উপদান সংযোজন : খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ বৃদ্ধির জন্যে গ্লুটামেট, তেল, টমোটো সস, বিভিন্ন ধরনের মসলা ইত্যাদি উপাদান সংযোজন করা হয়।
৪. বায়ুশূন্যকরণ ও কৌটাবদ্ধকরণ : কৌটার স্ফীতি, জারণ ও টিনের ক্ষয়রোধ করার লক্ষ্যে কৌটাকে বায়শূন্য করা হয় এবং পরে কৌটা বন্ধ করা হয়।
৫. ধৌতকরণ : বদ্ধকৃত কৌটার গায়ে লেগে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কৌটা ধৌতকরণ করা হয়।

৬. প্রক্রিয়াকরণ ও উত্তপ্তকরণ : উচ্চতাপে কৌটাস্থিত খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ১৫ পাউন্ড/ইঞ্চি চাপে ১২১° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কৌটাকে উত্তপ্ত করা হয়। সাধারণ ৩০ মিনিট তাপ দিতে হয়।

৭. ঠাণ্ডাকরণ : তাপ প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট কিছু দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে ঠাণ্ডা বায়ু বা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ঠাণ্ডাকরণ করা হয়।

৮. লেবেলিং : ঠাণ্ডাকরণ করার পর কৌটার দ্রব্যের নাম, কোম্পানির নাম, পুষ্টিমান, মেয়াদ উত্তীর্ণের সময় ইত্যাদি উল্লেখ করে কৌটার গায়ে লেবেলিং করা হয়।

৯. গুদামজাতকরণ : কৌটাজাতকরণের পরপরই উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত না করে বেশ কিছুদিন গুদামজাত করা হয়। কাঙ্ক্ষিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়ার জন্যই গুদামজাত করা হয়।

চ. ধূমায়িতকরণ (Smoking) : এটি একটি স্বল্পমেয়াদী মাছ সংরক্ষণ পদ্ধতি। ধূমায়িতকরণ হল মাছ সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়ার তাপমাত্রা এবং ধুয়াকণার যৌথক্রিয়ায় মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। মাছের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের জন্য বর্তমানে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এ পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় সংরক্ষণ কাজে এর ব্যবহার সীমিত হয়ে আছে।

ধূমায়িতকরণ পদ্ধতি : সাধারণত পরিপক্ব ও চর্বিযুক্ত মাছ ধূমায়িতকরণের জন্যে কাঁচামাল হিসেবে বেশি উপযোগী। ধূমায়নের জন্যে বড় মাছকে কেটে ফিলেট করতে হয় কিন্তু ছোট মাছকে কাটতে হয় না। ব্যাকটেরিয়া ও মোল্ড-এর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য মাছকে ৬০-৭০% লবণে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে পেশীতে ২-৩% লবণ প্রবেশ করে। ধূমায়িত মাছ সাধারণত কাঠের বাক্সে প্যাকিং করা হয়। এ পদ্ধতিতে ২-৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছ ও চিংড়ি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

মাছ সংরক্ষণ বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বোঝায় যে পদ্ধতিতে মাছের গুণগত মান ঠিকা রাখা যায়। মাছ সংরক্ষণের জন্যে কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো অণুজীব থেকে মাছকে দূরে রাখা, অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকলাপকে বিঘ্নিত করা, মাছ থেকে পানি অপসারণ করা এবং অণজীবকে ধ্বংস করা মৎস্য জাতীয় প্রাণি দ্রুত পচনশীল। সে হিসেবে চিংড়িও পচনশীল। এ পচনক্রিয়া চিংড়ি আহরণ করার পর থেকেই শুরু হয়। তাই চিংড়ি আহরণের পর যত দ্রুত সম্ভব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। সঠিক নিয়মে সঠিকসময়ে চিংড়ি সংরক্ষণ না করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিংড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন্ ধরনের মাছ টিনজাতকরণের জন্য উপযুক্ত?

(ক) ব্রুড মাছ (খ) পোনা মাছ

(গ) মাংশল ও চর্বিযুক্ত মাছ (ঘ) কোনটিই নয়

২। মাছ পঁচনের প্রধান কারণ কয়টি?

(ক) ১টি (খ) ২টি

(গ) ৩টি (ঘ) ৫টি

পাঠ-৫.২ মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ পরিবহন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মাছ পরিবহন

মাছ চাষের জন্য পোনা পরিবহনে দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাছ চাষে সফলতা আনার জন্য সুস্থ ও সবল পোনা অতীব প্রয়োজন। তাই মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনা পরিবহনের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক। রেণু পোনা মূলত: আঁতুড় পুকুর, লালন পুকুর ও মজুদ পুকুরের জন্য পরিবহণ করা হয়ে থাকে। পোনা পরিবহনকালে অক্সিজেন ঘাটতি, শারীরিক ক্ষত, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর পোনার মৃত্যুর হার অনেকাংশ নির্ভর করে। তাই পোনা পরিবহনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোনা মারা না যায় বা কম মারা যায় এবং আঘাত না পায়। পোনা পরিবহনের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং পোনা পরিবহনের পূর্বে পোনাকে কন্ডিশনিং বা টেকসই করে নিতে হয়।

পোনা টেকসই বা কন্ডিশনিং পদ্ধতি

পোনা পরিবহণের সময় যাতে মারা না যায় সেজন্য পোনাকে অবশ্যই টেকসই বা পরিবহনের উপযুক্ত করে নিতে হয়। যদি কাছাকাছি কোনো স্থানে পোনা পরিবহন করতে হয় তাহলে জালের মধ্যে পোনা রেখে চারদিকে পানির প্রবাহ দিতে হয়। এতে করে পোনা অল্প জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত হবে আর পানির প্রবাহে অক্সিজেনের সরবরাহ হওয়ার সাথে সাথে পোনা ভয় পায় এবং তাড়াতাড়ি করে মলমূত্র ত্যাগ করে ও বমি করে পেট খালি করে ফেলবে। ফলে পরিবহনের সময় পোনা মলমূত্র ত্যাগ করে পানি দূষিত করতে পারে না। আর পরিবহনের সময় যদি দীর্ঘ হয় তাহলে পোনাকে অধিকতর টেকসই করার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে পোনাকে হাপায় রেখে অথবা চৌবাচ্চায় অল্প পানির প্রবাহে রেখে একদিন উপবাসে রাখতে হবে। পোনাগুলো তখন হাপাতে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং তখন তাদের পেট প্রায় সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পরিবহনের সময় বমি বা মল ত্যাগ করে না এবং পরিবহনের পাত্র দূষিত হয় না। বাংলাদেশে পোনা পরিবহনের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। একটি সনাতন পদ্ধতি এবং অপরটি আধুনিক পদ্ধতি।

সনাতন পদ্ধতি

অতি প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে পোনা পরিবহনের জন্য মাটির পাত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে অবশ্য ধাতব পাত্র যেমন কেরোসিনের টিন, কাসা বা অ্যালমুনিয়ামের পাতিল ব্যবহৃত হচ্ছে। ধাতব পাত্রের পানি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ফলে পোনা মারা যেতে পারে। এ অবস্থায় ভেজা কাপড় বা চট পানিতে ভিজিয়ে পাত্রের গায়ে জড়িয়ে রাখলে পাত্র সহজে গরম হয় না। সাধারনত: ২০-২৪ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পাতিল দ্বারা ৩-৫ সে.মি. আকারের ৩০০-৬০০ টি পোনা তিন থেকে চার ঘন্টার পথ পরিবহণ করা যায়। মাটির পাতিলে বাষ্পীভবন খুব ভালো হয় বিধায় পানি ঠান্ডা থাকে। মাটির পাতিল বা হাড়ি দ্বারা পোনা পরিবহনকালে যেসব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সেগুলো হলো- পোনা পরিবহনকালে পাতিল বা হাড়িতে বেশ জোরে এবং বেশি বেশি ঝাঁকনি দেয়া উচিত নয় কেননা এতে অনেক পোনা পাতিলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে জখম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নলকূপের বা টেপের পানি দ্বারা পাতিল বা হাড়ির পানি বদলানো উচিত নয় কেননা এধরনের পানিতে ক্লোরিন থাকে যাতে পোনা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সতর্কতার সাথে পানি বদলাতে হবে এবং পোনা পরিবহনের সময় পানি বদলানোর জন্য মগ, গামছা এবং বালতি ইত্যাদি সাথে রাখা উচিত।

সনাতন পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের সময় প্রধানত ঃ দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-
ক. পোনা পরিবহনের সময় যেন অক্সিজেনের অভাব না হয়।
খ. পরিবহনের সময় পোনা যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

পোনা পরিবহনের আধুনিক পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনের জন্য অক্সিজেন পূর্ণ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতি অধিক নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে পোনা পরিবহন বেশ সহজ। রেণু অথবা ধাণী পোনা পরিবহনের জন্য অক্সিজেনপূর্ণ পলিথিন ব্যাগই উত্তম। ব্যাগের $\frac{১}{৩}$ অংশ পানি এবং $\frac{২}{৩}$ অংশ অক্সিজেন দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। ভর্তিকৃত অক্সিজেনের ৬০ ভাগ হবে গ্রহণ যোগ্য অক্সিজেন। প্রথমে ব্যাগে পানি ভর্তি করে পরে সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন পূর্ণ করা হয়। চটের ব্যাগের পরিবর্তে কার্ডবোর্ড, কার্টুনও ব্যবহার করা যায়। পরিবহনের দূরত্ব, পরিবহন পাত্রের আকার বা পানি ধারণ ক্ষমতা ও পোনার আকারের ওপর ভিত্তি করে পোনার পরিমান নির্ণয় করতে হয়। একটি ৮-১০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবহন পাত্রে ১২-১৮ ঘন্টা পর্যন্ত নিচের সারণি অনুযায়ী রেণু পোনা পরিবহন করা সম্ভব।

সারণি: পোনার সাইজের পার্থক্যভেদে পরিবহণযোগ্য পোনার সংখ্যা

আকার	সংখ্যা
০.৬ সে. মি.	২৫০০ টি
১.২৫ সে. মি.	১৪০০ টি
২.৫ সে. মি.	৫০০ টি
৩.৪ সে. মি.	৩০০ টি
৫.০ সে. মি.	২৫০ টি
৭.৫ সে. মি	১০০ টি

আধুনিক পদ্ধতিতে পোনা পরিবহনকালেও বেশ কতগুলো সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যেমন-

ক. পোনা পরিবহনের জন্য পোনা সাধারণত প্রতিটি প্যাকেটের জন্য দুটি করে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে।

খ. সমান আকারের দুটি পলিথিন ব্যাগ একটির ভিতর আরেকটি ঢুকিয়ে ব্যাগে পরিণত করতে হবে।

গ. পোনা পরিবহনের সময় দূরত্বের উপর নির্ভর করে ব্যাগে পোনা পূর্ণ করতে হয়। দূরত্ব কম হলে পোনার সংখ্যা বেশি হবে আর দূরত্ব বেশি হলে পোনার সংখ্যা কম হবে।

ঘ. যাতায়াতের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোনার বাক্স ছায়া ও নিরাপদ স্থানে থাকে।

ঙ. কোনোভাবেই যেন ব্যাগ কেটে বা ছিঁড়ে না যায় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

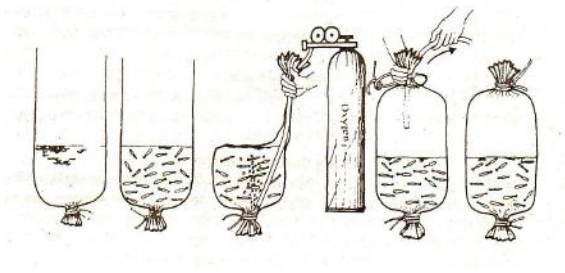

চিত্র ৫.২.১ : অক্সিজেনযুক্ত পলিথিন ব্যাগে পোনা পরিবহণ।

মাছ বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছ বাজারজাতকরণের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো :

১. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি : মাছ বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়। কারণ মাছ ক্রয়-বিক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, ব্যবসা প্রভৃতি কাজের জন্যে অনেক লোক নিয়োজিত থাকে। মাছ উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. মৎস্য পণ্যের সুষম যোগান : বাংলাদেশে এমন অনেক এলাকা আছে যেখানে মাছ উৎপাদন হয় না। এই জন্যে বিভিন্ন এলাকার ভোগকারীগণ যাতে সব ধরনের মাছ ভোগ করতে পারে এবং সুষম খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এজন্যে মৎস্য পণ্য সঠিকভাবে বাজারজাত করতে হবে যাতে সঠিকভাবে সবাই যোগান পায়।

৩. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : বাংলাদেশে থেকে মাছ রপ্তানী করে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয়। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যের স্থানানুসারে শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ করা হলে বিদেশে আমাদের মাছের বাজার বিস্তৃত হবে এবং অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বাংলাদেশের মাছ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা প্রধানতঃ ২ প্রকার। যথা-

- অভ্যন্তরীণ মাছ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা।

- **অভ্যন্তরীণ মাছ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের মাছের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান থাকার কারণে অভ্যন্তরীণ বাজারে মাছ বিপণন খুবই সহজ। বাজারে বিভিন্ন স্তরের ক্রেতা থাকলে ছোট-বড় দামি ও কম দামি মাছ সহজে বিক্রি হয়ে যায়। মাছ ব্যবসায়ীরা মাছ আহরণ-পরবর্তী পরিচর্যার চেয়ে অধিক মুনাফা অর্জনে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিএফডিসি (বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা) আহরিত মাছ দেশের ভিতর ও বিদেশে উভয় বাজারের জন্য বিপণন করে। নিচে মাছ বিপনন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :
  ১. আড়ৎদার : চালানীরা মাছ এনে জমা রাখে আড়তদারদের কাছে। আড়তদারগণ শুধু পাইকারী মূলে মাছ বিক্রি করে।
  ২. পাইকারি বিক্রেতা : আড়তদাররা নিলামের মাধ্যমে পাইকারি বিক্রেতার কাছে মাছ বিক্রয় করে। এরপর খুচরা বিক্রেতাগণ পাইকারি বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করে।
  ৩. চালানী : চালানীরা পাইকারীদের কাছ থেকে মাছ ক্রয় করে বাক্স ভর্তি করে পরিবহনের মাধ্যমে শহরে আনে। মাছ বহনের জন্যে বর্তমানে বিভিন্ন ইঞ্জিন চালিত পরিবহন ব্যবহার করা হচ্ছে।
  ৪. খুচরা বিক্রেতা : খুচরা বিক্রেতারা স্টলে বা বাজারে বসে ভোক্তাদের কাছে মাছ বিক্রি করে এবং বড় বড় শহরে ভ্যান ও মাথায় করে মাছ বিক্রি করে বেড়ায়।
- **আন্তর্জাতিক মাছ বাজার ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ থেকে প্রক্রিয়াজাত মাছ বিদেশে রপ্তানী করা হয়। এ সকল মৎস্যজাতপণ্য অধিকাংশই সমুদ্রপথে রপ্তানি হয়। মোট রপ্তানিকৃত মৎস্যজাত পণ্যের ৯০% চিংড়ি ও বাকি ১০% অন্যান্য মাছ। হিমায়িত মৎস্য পণ্যের প্রধান বাজার হলো আমেরিকা, ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান এবং জার্মানি। বাংলাদেশ থেকে যে সকল মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে তার মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের। এছাড়া কিছু কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এ সকল পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছ পরিবহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

মাছ চাষের জন্য পোনা পরিবহনের দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পোনা পরিবহনকালে অক্সিজেন ঘাটতি, শারীরিক ক্ষত, অ্যামোনিয়া, তাপমাত্রা ইত্যাদির ওপর পোনার মৃত্যুর হার অনেকাংশে নির্ভর করে। পোনা পরিবহনের সময় দূরত্বের ওপর নির্ভর করে ব্যাগে পোনা পূর্ণ করতে হয়। দূরত্ব কম হলে পোনার সংখ্যা কম হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পোনা পরিবহনের সময় কয়টি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত?

(ক) ৩ টি (খ) ২ টি
(গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

২। পোনা পরিবহনের জন্য কত অংশ অক্সিজেন দ্বারা পূর্ন করতে হবে?

(ক) $\frac{১}{৩}$ (খ) $\frac{১}{৪}$
(গ) $\frac{২}{৩}$ (ঘ) $\frac{১}{২}$

পাঠ-৫.৩ চিংড়ি পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চিংড়ি পরিবহন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিংড়ি সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির নাম বলতে ও লিখতে পারবেন।
- চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ও বাজারজাত করণ।

চিংড়ি পরিবহনঃ চিংড়ি পরিবহন বলতে বোঝায় চিংড়ি আহরণের পর আহরণের স্থান হতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বা ভোক্তা বা ক্রেতার নিকট পৌঁছানো। আর চিংড়ি বাজারজাতকরণ বলতে সাধারণ অর্থে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ির গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে সংরক্ষণ করে বাজারে বিক্রি করাকে বোঝায়। চিংড়ি বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম উৎস। চিংড়ি পঁচনশীল প্রাণি তাই চিংড়িকে পঁচন থেকে রক্ষা করে চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাত করতে হয়। এতে করে চিংড়ি চাষিরা লাভবান হবে এবং দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে। তাই উপযুক্ত পদ্ধতিতে চিংড়ি পরিবহন ও বাজারজাত করার প্রয়োজন।

চিংড়ি পরিবহন ও বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা :

১. খাওয়ার উপযোগী চিংড়িকে ক্রেতার নিকট চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছানো।
২. বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।
৩. এক স্থানের চিংড়ি দিয়ে অন্য স্থানের চাহিদা পূরণ করা।
৪. চিংড়িকে পঁচনের হাত থেকে রক্ষা করা।
৫. সারা বছর বাজারে বা ভোক্তার নিকট চাহিদা অনুযায়ী চিংড়ি সরবরাহ করা।
৬. চিংড়ির দাম ভালো পাওয়া।
৭. দেশের রাজস্ব ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।
৮. দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

চিংড়ি পরিবহনের সময় করণীয় বিষয় : চিংড়ি পরিবহনের সময় নিচের পরিচর্যাগুলো অনুসরণ করতে হবে।

ক. নৌকা বা জাহাজের উপর পরিচর্যা :

১. চিংড়িকে আকার ও প্রজাতি অনুসারে পৃথক করতে হয়।
২. এমনভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যেন আঘাত না পায়।
৩. ব্যবহারকারীর জন্য পাত্র, ঝুড়ি এমনভাবে হতে হবে যেন সহজে পরিষ্কার করা যায়।
৪. সূর্যালোক যেন না পড়ে সেভাবে রাখতে হবে।
৫. ক্লোরিনযুক্ত (৫-১০ পিপিএম) পানিতে ধুয়ে নিলে ভালো হয়।
৬. প্রতিবার চিংড়ি রাখার পূর্বে জিনিসপত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
৭. ডেক, চিংড়ির ঘর, বালতি, পাত্র, বরফ ভাঙ্গার কাঠ বা লাঠি ইত্যাদি ক্লোরিন পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে।
৮ চিংড়ি বেশিক্ষণ বাইরে রাখা যাবে না।

খ .চিংড়ি খালাস ও পরিবহনের সময় পরিচর্যা-

১. চিংড়ি খালাস করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন চিংড়ির গায়ে কোন আঘাত না লাগে।
২. খালাসের পর চিংড়িকে পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে এবং পূনরায় বরফ দেওয়ার প্রয়োজন হলে দ্রুত দিতে হবে।
৩. চিংড়ি পরিবহনের সময় প্লাস্টিক বাক্স ব্যবহার করাই উত্তম। কাছাকাছি পরিবহনের ক্ষেত্রে তাপ প্রতিরোধ বাক্স ব্যবহার করাই উত্তম।
৪. দূরে চিংড়ি পরিবহনের ক্ষেত্রে শীতল ভ্যান ব্যবহার করা উত্তম এবং যত দ্রুত সম্ভব পরিবহন করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. চিংড়ি খালাসের সময় বাক্সের উপর দাঁড়ানো বা স্তুপাকারে রাখা যাবে না।

৬. ঢাকনাওয়ালা ও তলায় ছিদ্রযুক্ত ধাতু নির্মিত পাত্র যথাযথভাবে বরফ দিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ (Shrimp Processing)

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ বলতে সাধারণ অর্থে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়িকে দীর্ঘসময় গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। চিংড়ি আহরণের পর দ্রুত প্রক্রিয়াজাত করতে হয়। চিংড়িতে রয়েছে আমিষ, শ্বেতসার, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন। চিংড়ি আহরণের পর যথাসময়ের মধ্যে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত না করলে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করে। বিদেশের ক্রেতারা ক্রয় করতে চায় না। এতে রপ্তানির সমস্যা দেখা দেয়। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরনের আধুনিক পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলা :

প্রথমে সমুদ্রে উপকূলবর্তী এলাকা বা ঘের থেকে ঝুড়ি বা বাক্স ভর্তি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে আনা হয় এবং ছোট-বড়, ভালো-খারাপ ইত্যাদির ভিত্তিতে মাথা ছাড়িয়ে গ্রেডিং করা হয়। এরপর গ্রেডিং করা মাছকে বরফ গলিয়ে ক্লোরিনযুক্ত চলমান পানি দ্বারা (২০ পি.পি.এম) ধৌত করা হয়। যদি একসঙ্গে বেশি মাছ আসে তবে যে মাছগুলো ধৌত করা হবে সেগুলো ঠাণ্ডা ঘর থেকে বের করে বাকিগুলো ঠাণ্ডাঘরে রাখতে হবে। মোট কথা চিংড়ি বেশিক্ষণ বাইরে রাখা যাবে না। এরপর মাথাসহ ও মাথাবিহীন চিংড়িকে আলাদা করে ১০ পিপিএম ক্লোরিন মিশ্রিত অবস্থায় ধৌত করার পর ওজন নিয়ে চিংড়িগুলো প্যানিং ট্রেতে সুন্দর করে সাজানো হয় এবং ৩-৫ পিপিএম ক্লোরিন মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে প্যানিং ট্রে ভরে পলিথিন দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। তারপর প্যানিং ট্রেগুলো প্লেটা বা কন্ট্রাক্ট ফ্রিজারে নির্দিষ্ট চেম্বারে স্থাপন করে- ৩৫° থেকে -৪০° সে. তাপমাত্রায় হিমায়িত করা হয়। সময় লাগে ১৫ মিনিট থেকে ২-৩ ঘণ্টা এবং প্যানিং ট্রেতে ৪-৮টি ব্লক করা যায়। প্রতি ব্লকের ওজন বিভিন্ন মাপের করা যায় যেমন : ১ কেজি, ১.৮ কেজি ইত্যাদি। এ গ্লেজিং মাছকে শুষ্ক বোধ করে এবং পচনকে বাধাগ্রস্ত করে। ২-৩ ঘণ্টার কম সময় হিমায়িত করলে মাছের গুণগত মান ভালো থাকে না। গ্লেজিং করার পর চিংড়ির ব্লকগুলোর অভ্যন্তরীণ মোড়ক (ইনার কার্টুনে) ভরে সিল করা হয় এবং কার্টুনের গায়ে নিম্নোক্ত তথ্য থাকে।

ক. কোম্পানির নাম, খ. চিংড়ির প্রকৃত ওজন, গ. চিংড়ির নাম ও গ্রেড, ঘ. ব্যাচ বা কোড নম্বর, ঙ. পাউন্ড প্রতি চিংড়ির সংখ্যা, চ. রপ্তানিকারকের ঠিকানা। ৬ বা ১০টি ইনার কার্টুন একটি মাস্টার কার্টুনের মধ্যে ভরে পলি প্রপাইলিন (পিপি) বেল্ট দিয়ে মোড়ক বাঁধা হয়। তারপর হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয় রপ্তানির জন্য এবং রপ্তানি করা হয়।

চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি ফ্লো-চার্টের নিম্নে মাধ্যমে দেখানো হলো :

চিংড়ি বাজারজাতকরণ

(Marketing of Shrimp)

চিংড়ি বাজারজাতকালীন অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

চিংড়ি বাজারজাতকরণের চেইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় চেইনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী যেমন- পোনা, খাদ্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহে নানা ধরনের মধ্যসত্বভোগী সংশ্লিষ্ট থাকায় সমষ্টিগতভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ও চিংড়ির মান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় না। চিংড়ি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞানতা, চিংড়ি খামার হতে বিক্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব, বাজার দরের তথ্য না পাওয়া, সর্বোপরি দাদন ব্যবসার শর্তের কারণে চাষি চিংড়ির ন্যায্যমূল্য পায় না।

চিংড়ির বাজার অবকাঠামো নিম্নরূপ :

আমাদের চিংড়ির বিপণন ব্যবস্থা অধিক মধ্যসত্বভোগীর কারণে বেশ জটিল। এ ব্যবস্থায় চাষি পর্যায় থেকে ফড়িয়া, পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে ছোট ডিপো, বড় ডিপো, আড়তদার, পাইকার, কমিশন এজেন্ট হয়ে সর্বশেষ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় চিংড়ি সরবরাহ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের চিংড়ি বাজারজাতকরণ পদ্ধতির ফ্লোচার্ট নিম্নে দেখানো হলো :

চিংড়ি চাষী : চিংড়ি খামারের অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে চাষীগণ সরকারি খামারে ফড়িয়াদের নিকট অথবা ছোট ডিপো বা আড়তে চিংড়ি বিক্রয় করেন।

ফড়িয়া : ফড়িয়াগণ সরাসরি চিংড়ি চাষীদের নিকট থেকে চিংড়ি ক্রয় করে ছোট ও বড় ডিপোতে বিক্রয় করে থাকে।

আড়তদার : চিংড়ি চাষী যারা ফড়িয়া বা আড়তদার এর নিকট দাদন গ্রহণ করে না বা চুক্তিবদ্ধ থাকে না, তারা তাদের উৎপাদিত চিংড়ি সরাসরি আড়ত বা নিলাম কেন্দ্রে বিক্রয় করতে পারেন।

ডিপো মালিক : ডিপো মালিকগণ চিংড়ি চাষী বা ফড়িয়াদের নিকট থেকে চিংড়ি ক্রয় করে থাকেন। ডিপো মালিকগণ চিংড়ি ক্রয় করার জন্য চাষী ও ফড়িয়াদের ঋণ প্রদান করেন।

পাইকার :সাধারণত পাইকাররা বিপুল সংখ্যক চিংড়ি আড়তদারের নিকট থেকে সংগ্রহ করে থাকে। কোনো কোনো পাইকার কমিশন এজেন্টের প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করে থাকে। তাছাড়া আড়তদারে নিকট থেকে নিলামের মাধ্যমে ও দরকষাকষির মাধ্যমে চিংড়ি ক্রয় করে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রেরণ করেন।

কমিশন এজেন্ট : কমিশন এজেন্টগণ একাউন্টহোল্ডার হিসেবে কাজ করে থাকেন। যারা বড় ডিপো মালিক বা পাইকারের সাথে রপ্তানিকারকদের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করেন। কমিশন এজেন্টগণ সাধারণত প্রতি কেজি চিংড়ির জন্য ৫ টাকা হারে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে কমিশন পেয়ে থাকেন।

প্রক্রিয়াকরণকারী/রপ্তানিকারক : সাধারণত প্রক্রিয়াকরণকারী কমিশন এজেন্টের মাধ্যমে পাইকার বা বড় ডিপো থেকে চিংড়ি ক্রয় করে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। তারা অভ্যন্তরীণ এবং বৈদশিক বাজারের মধ্যে চিংড়ি বৈদেশিক রপ্তানি বাজারের মধ্যে চিংড়ি সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থার জন্য চূড়ান্ত ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা চিংড়ি পরিবহন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাত করণের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

চিংড়ি পচনশীল দ্রব্য, তাই এদের আহরণের পর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাতকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টিনজাতকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে চিংড়িকে সম্পূর্ণরুপে বায়ুশূন্য পাত্রে আবদ্ধ করে অতি উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে জীবাণু মুক্ত করা হয়। ধুমায়িতকরণ হলো চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কাঠ পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন ধোয়ায় তাপমাত্রা এবং ধোঁয়া কণার যৌথ ক্রিয়ার মাধ্যমে মাছের দেহ থেকে পানি অপসারিত হয়। সাধারণত পরিপক্ক ও চর্বিযুক্ত মাছ এবং চিংড়ি ধূমায়নের জন্য কাঁচামাল হিসেবে বেশি উপযোগী। বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগের অংশ হিসেবে মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা আহরিত চিংড়ী অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই বাজারজাতকরণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রেডিং করা চিংড়ি মাছকে কি দ্বারা ধৌত করা হয়?

ক) হাইড্রোজেন খ) ক্লোরিণ

গ) পানি ঘ) নাইট্রোজেন

পাঠ-৫.৪ ব্যাবহারিক : ফরমালিন শনাক্তকারী কীট দ্বারা ফরমালিনযুক্ত মাছ শনাক্তকরণ

প্রাসঙ্গিক তথ্যঃ

ফরমালডিহাইড বা মিথানল গ্যাসের ৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে। ফরমালিন মূলত: জীবাণুনাশক রাসায়নিক তরল পদার্থ যা ল্যাবরেটরীতে নমুনাসমূহ বিকারের মধ্যে ফরমালিন দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ বিশেষ সংরক্ষণের জন্য এবং মৃতু প্রানী, মানুষ প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য ফরমালিন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীরা অনেক সময় খাদ্যদ্রব্যে বা মাছে ফরমালিন মিশিয়ে দেয়। সুতরাং মাছে ফরমালিন দেয়া হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার

নিরাপদ মাছের (ফরমালিনমুক্ত) লক্ষণসমূহ :

- দেহে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে।
- মাছ সহজে পঁচে যায়।
- মাছে মাছি পড়ে।
- মাছের স্বাভাবিক গন্ধ থাকে।
- ফুলকা লালচে বর্ণের থাকে।
- দেহ ভেজা থাকে।
- মাংশপেশি এবং আঁইশ নরম থাকে।
- চক্ষু স্বাভাবিক থাকে।

ফরমালিনযুক্ত মাছের লক্ষণসমূহ :

- মাছের গায়ে মাছি বসে না।
- মাছ সহজে পঁচে না।
- ফরমালিনের হালকা কটু গন্ধ থাকবে।
- মাছ অসার বা শক্ত মনে হবে।
- মাছের শরীর অনেকটা রাবারের মত মনে হবে।
- মাছের দেহের স্বাভাবিক গন্ধ থাকবে না।
- মাছের ফুলকা কালচে এবং আইশ শুষ্ক মনে হবে।
- চক্ষু ফ্যাকাশে ও ভিতরের দিকে থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

ক. ফরমালিন শনাক্তকারী কিট। খ. একটি প্লেট বা ট্রে। গ. ওয়াশ বোতল। ঘ.বিকার। ঙ. পাতিত পানি। চ. মেজারিং সিলিণ্ডার।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

১. প্রথমে বাজার থেকে সন্দেহযুক্ত মাছ সংগ্রহণ করে ট্রে-এর উপর রাখতে হবে।
২. এবার ওয়াশ বোতলের পাতিত পানি ব্যবহার করে মাছটি ধুয়ে ফেলতে হবে।
৩. ধোয়ার পর সেই পানি সংগ্রহ করে ৫ মিলি পানি একটি টেস্ট টিউবে রাখতে হবে।
৪. এবার ফরমালিন কীট থেকে দ্রবণ-১ এর ১৫ ফোটা, মাছ ধোয়া পানির মধ্যে ফেলতে হবে এবং ১৫ সেকেন্ড ঝাঁকাতে হবে।
৫. অতপর ফরমালিন কীটের দ্রবণ-২ একইভাবে ১৫ ফোটা উক্ত টেস্ট টিউবে মাছ ধোয়া পানির মধ্যে আবার ফেলতে হবে এবং ১৫ সেকেন্ড ঝাঁকাতে হবে।

৬. একইভাবে দ্রবণ-৩ উক্ত টেস্ট টিউবে আবার ১৫ ফোটা ফেলে ১৫ সেকেন্ড ঝাঁকাতে হবে এবং রঙ পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত :

১. যদি মিশ্রিত দ্রবণ সবুজাভ বর্ণ থেকে লালচে রং-এ পরিবর্তন হয় তবে মাছটিতে ফরমালিন ছিল।
২. যদি রং অপরিবর্তিত অথবা রংহীন হয় তাহলে বুঝতে হবে মাছে ফরমালিন ছিল না।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রুনা লায়লা বাজার থেকে ফেরার পথে একটি বড় রুই মাছ কিনে আনলেন। তিনি বাড়িতে এসে সন্দেহবশত দেখলেন মাছের আইশগুলো কেমন ফ্যাকাশে ও কৃত্রিম মনে হচ্ছে। তিনি ফরমালিন কীট ব্যবহার করে মাছটি পরীক্ষা করে দেখলেন তাতে ফরমালিন দেয়া আছে।
ক. মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কী?
খ. বরফজাত পদ্ধতি বলতে কী বুঝায়?
গ. রুনা লায়লার ধারণা অনুযায়ী ফরমালিন দেয়া এবং ফরমালিন না দেয়া মাছ চেনার উপায় কী?
ঘ. রুনা লায়লার পদ্ধতি অনুযায়ী মাছে ফরমালিন শনাক্ত করার উপায় ব্যাখ্যা ধরুণ।

২। বাংলাদেশে কোনো কোনো মৌসুমে প্রচুর পরিমানে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা হয়। আহরিত মাছ ও চিংড়ি যথাসময়ে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব হয় না বিধায় পরবর্তী সময়ে সরবরাহ করতে হয়।
ক) মাছ সংরক্ষণ কী?
খ) কী কী পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করা যায় তা লিখুন।
গ) উদ্দীপকের আলোকে আহরিত প্রচুর পরিমাণ মাছ পরবর্তী সময়ে সরবরাহের জন্য করনীয় কাজ সম্পর্কে লিখুন।
ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চিংড়ি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৩। মামুন সাহেব ছুটিতে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল বাঁশের মাচায় মাছ শুকানো হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট লোকজন তাকে বললো এ পদ্ধতিতে মাছ সংরক্ষণ করে অনেক দিন রাখা যায়।
ক) শুটকীকরণ কী?
খ) মাছ শুটকীকরণের উদ্দেশ্য লিখুন।
গ) মামুনের দেখা মাছ শুটকীকরণ পদ্ধতিটি বর্ণনা করুন।
ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে মামুনের দেখা শুটকীকরণ পদ্ধতিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৪। জাহিন কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে তার বাবা বলল এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মাছ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরিবহন করা হয়।
ক) মাছ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?
খ) বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের সুবিধাগুলো লিখুন।
গ) উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মাছ পরিবহন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।
ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। খ